প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র

ঊনবিংশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব জড়তাচ্ছন্ন প্রাণকে সজীবতা দিয়েছে, স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতাকে সচেতন মনুষ্যবোধে উত্তীর্ণ করেছে। ইংরেজ জাতি আমাদের শোষণ করেছে একথা সত্য, সেইসঙ্গে একথাও সত্য যে তারা নিয়ে এসেছিল নব প্রাণের ছন্দ। ইংরেজি শিক্ষা, পাশ্চাত্য দর্শন নব্য শিক্ষিতদের নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছে। দীর্ঘ দিনের প্রথাবদ্ধ জড়তা থেকে মুক্তির আনন্দ কে না পেতে চায়? সাহিত্য-সমাজে আমরা সেই মুক্তির স্বাদ পেয়েছি বিদ্যাসাগর, রামমোহন, ডিরোজিও, মধুসূদন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের দ্বারা। অনেকেই এই স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতায় রূপান্তরিত করেছিল— ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা, ভবানীচরনের প্রবন্ধ প্রভৃতি সে সাক্ষ্য বহন করে। একদিকে 'ব্রাহ্মসমাজ', ডিরজিওপন্থী অন্যদিকে 'ধর্মসভা', সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা— স্বাভাবিক ভাবেই দ্বন্দ্ব উপস্থিত। এই ঐক্যসঙ্কটে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একদিকে ধর্মকে কেন্দ্র করে জীবন জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হন, অন্যদিকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও অর্থনীতি ব্যাখ্যা করেন। এই প্রেক্ষিতে তাঁর প্রবন্ধগুলির কয়েকটি মাত্রা রয়েছে—

ক) বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ
খ) ধর্ম-দর্শন কেন্দ্রিক প্রবন্ধ
গ) ইতিহাস-দেশভক্তি মূলক প্রবন্ধ
ঘ) সমাজ-অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ
ঙ) সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা কেন্দ্রিক প্রবন্ধ ইত্যাদি।

'বঙ্গদর্শনের' মাধ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ প্রবন্ধের প্রকাশ দেখা যায়। সমকালীন সমাজ বিজ্ঞানের আদর্শে জীবনের প্রেরণা পেয়েছে। 'প্রভাকর' সম্পাদক ১৮৪৭ এর সম্পাদকীয় অংশে উল্লেখ করেছেন—**' বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাদুর্ভাব না হইলে কোনোরূপেই দেশের মঙ্গল সম্ভাবনা নাই।'** একই পথে হেঁটেছে 'বিজ্ঞান সেবধি', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকগণও। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি আজকের যুগে আকর্ষণ অনুভব না করলেও শতাধিক বর্ষ পূর্বে বহু পাঠকের বিস্ময়ের আধার ছিল। 'বিজ্ঞানরহস্য' গ্রন্থে 'আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত', 'আকাশে কত তারা আছে?', 'কত কাল মনুষ্য?', 'পরিমাণ-রহস্য', 'চন্দ্রলোক' প্রভৃতি প্রবন্ধে বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে তিনি প্রবন্ধগুলিকে নিরস আলোচনার মধ্যে বন্দি রাখেননি, শিল্পীর তুলির স্পর্শে সাহিত্যরসের সমাগম করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা তুলে ধরতে পারি—

' এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায, বিচ্ছেদে, মিলনে, —অলঙ্কারে, খোশামোদে,—তিনি উলটি পালটি খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকররেখা, শশী মসি ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন...।'

— এভাবেই জীবদেহের গঠন কিংবা তারার গমন বিচিত্র ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক পদচারনা লক্ষ করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালির মধ্যযুগীয় ধর্মীয় বিশ্বাসে এবং বহুদেববাদী পৌত্তলিকতায় আঘাত এনেছিলেন রামমোহন। তিনি দার্শনিক বেকনের মতো ঘোষনা করেছিলেন — জ্ঞানই শক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধর্ম বিষয়ে ছিলেন মানবতাবাদী। তবে তিনিও অনেক ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের মতো সংশয়বাদী। তাই কখনো তিনি সনাতন ধর্ম ভাবনায় রক্ষনশীল আবার কখনো সমাজবিজ্ঞানীর মতো প্রগতিশীল। ধর্মকে সমাজের হিতার্থে ব্যবহার করতে রচনা করেন 'কৃষ্ণচরিত্র'। এখানে তিনি জানিয়েছেন—'কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।' এখানে তিনি প্রগতিশীল। তাই জানান— **'ধর্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্দারা প্রাণীগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম।'** বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্মভাবনাই আরোপিত হয়েছে স্বদেশচেতনা কিংবা রাজনীতি প্রসঙ্গে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছিলেন—**'কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশি সখ ছিল।'** — এ কথা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'বাঙ্গালার ইতিহাস'। তিনি মনে করেন—**'বাঙ্গলার ইতিহাস চাই। নাহলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না।'** এই ইতিহাসের স্তরেই এসেছে তাঁর সমাজচেতনা। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা'

Download Free Notes From www.banglasahitya.in

রচনাতে সমকালীন ভারতে ইংরেজ ও প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণের স্তুতিবাদ অবশ্যই রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত মানসিকতারই প্রতিফলন হিসেবে ধরা হয়। সমালোচকের মতে তাঁর ধর্ম চিন্তায় ছিল হিন্দুর পুনর্জাগরনের আকাক্ষা এবং স্বদেশপ্রীতির আতিশয্যে আন্তর্জাতিক উদারনৈতিক দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নি। একথা অনেকাংশে সত্য হলেও আমাদের মনে হয় পরাধীন ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক বোধ জাগানোর থেকে স্বদেশভক্তিই দেশীয় মানুষকে বিপ্লবী হতে বেশী সাহায্য করেছি । আমরা ভুলতে পারিনা বন্দেমাতরম ধ্বনি। এই স্বদেশচিন্তাই তাঁকে সমাজভাবনা সমৃদ্ধ রচনায় অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

তাঁর সামাজিক-অর্থনীতি বিষয়ক রচনা— 'সাম্য' ও 'বঙ্গদেশের কৃষক'। ১৮৭২ খ্রি. বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়— 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি। এ প্রবন্ধটি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত—'দেশের শ্রীবৃদ্ধি', 'জমিদার', 'প্রাকৃতিক নিয়ম', ও 'আইন'। প্রবন্ধটিতে দেশীয় প্রজাদের দূরাবস্থার চিত্র যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাদের মুক্তির উপায়। এখানে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক মনের চিত্র খুঁজে পাই। তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধে নারীদের বৈষম্যের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। এখানে পুরুষতন্ত্রের চরিত্রের বিরুদ্ধে নেমে এসেছে প্রশ্নবান— ' **ধর্মভ্রষ্ট পত্নী বিষয় পাইবে না, ধর্মভ্রষ্ট পুরুষ পাইবে কেন ?...ইহা যদি ধর্মশাস্ত্র তবে অধর্মশাস্ত্র কি ?**' বিদ্যার্জনের সঙ্গে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর অধিকার যে পুরুষের সমান থাকা দরকার একথা তিনি বার বার বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এ ভাবনা 'দূর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুন্ডলা', 'দেবী চৌধূরাণী' প্রভৃতি উপন্যাসেও আলোচিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যসমালোচনা কেন্দ্রিক প্রবন্ধগুলিই অধিক আলোচিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য—'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'উত্তরচরিত', 'গীতিকাব্য', বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা-মিরন্দা এবং দেসদিমোনা'। 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে তিনি কাব্যের তিনটি ধারার কথা বলেছেন— দৃশ্যকাব্য তথা নাটকাদি, আখ্যানকাব্য ও খন্ডকাব্য। গীতিকাব্য সম্পর্কে তিনি সহজেই বলে ফেললেন— 'গীতের যে উদ্দেশ্য যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য।' সত্যিই আমাদের চমকিত করে। 'শকুন্তলা-মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধে তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে শকুন্তলা চরিত্রের প্রাণময়তার ছবি স্পষ্ট করে তুলেছেন। একঅর্থে তিনি ভারতীয়ত্ত্বকেই উপরে স্থান দিয়েছেন।

সেইসঙ্গে রম্যরচনা হিসেবে 'কমলাকান্ত' উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমের বিচিত্র হৃদয়বৃত্তি সহস্রমুখী, ফলে এই রচনাগুলির জাত-নির্ণয় কঠিন। কবিত্বময় গদ্য রচনা হিসেবেই এর স্বীকৃতি।

অবশেষে বলা যায় প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র বিষয় উপস্থাপনে,ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনে, যুক্তি সজ্জার মেলবন্ধনে সার্থকতা দেখাতে পেরেছেন।

BANGLA SAHITYA

Download Free Notes From www.banglasahitya.in